গিরিবালা

(গল্পগ্রন্থ – নীলগঞ্জের ফালমন্ সাহেব)

দেশের বাড়িতে অনেকদিন ছিলাম না। গ্রামের অন্য পাড়ার লোকদের ভালো ভাবে চিনিনে বা জানিনে।

সেবার মাঘমাসের দিন, বাজার থেকে ফিরচি, এমন সময় একটি সাদা থান-পরা বিধবা স্ত্রীলোক বিনীত সুরে বললে—একটু দাঁড়ান বাবা—

পরে সে সাষ্টাঙ্গে আমাকে প্রণাম করলে।

এরকমভাবে প্রণাম পেতে আমি অভ্যস্ত নই। সঙ্কুচিতভাবে বললাম—এসো মা এসো। কল্যাণ হোক।

—ও বেলা কি বাড়ি থাকবেন?

—হ্যাঁ, কেন বলো তো?

—আমি একবার যাবো এখন আপনার কাছে।

—বেশ।

মনে ভাবতে ভাবতে এলাম, মেয়েটিকে আমি অনেকদিন আগে যেন কোথায় দেখেছি। তখন ওর এরকম বিধবার বেশ ছিল না। তা ছাড়া এখন ওর বয়েসও হয়েছে।

বিকেলবেলা যখন মেয়েটি আমার বাড়ি এল, তখন ওকে ভালো করে চিনলাম। এ দেখচি সেই গিরিবালা। এর যৌবনবয়সে আমি একে অনেকবার দেখেছি, তখন এর বেশভূষা ছিল অন্যরকম। বাজারে যাবার আসবার পথে একে রূপের ঝলক ছুটিয়ে হেলেদুলে চলতে দেখেছি। তখন এর পরনে ছিল লালপেড়ে শাড়ি, বাহুতে অনন্ত, হাতে বালা, কানে মাকড়ি, গলায় হার, কোমরে রুপোর গোট্। অনেকদিনের কথা, তখন ম্যাট্রিক পাশ করে সবে কলেজে ভর্তি হয়েছি। কার কাছে যেন শুনেছিলাম ওর নাম গিরিবালা, চরিত্রের পবিত্রতার জন্যে বিখ্যাত নয়। সেই থেকে ওকে দেখলে পাশ কাটিয়ে বরাবর চলে গিয়েছি।

গিরিবালার দিকে ভালো করে চেয়ে দেখলাম।

এখন ওর বয়েস হয়েছে, যৌবনে কি রকম ছিল আমার মনে হয় না, তবে এখন ওকে দেখে মনে হয় না কোনোদিন ওর যৌবন ছিল। তবে রংটা এখনো বেশ ফর্সা আছে, চোখদুটি এখনো সুন্দর।

মনে ভাবছিলাম গিরিবালার কি দরকার আমার কাছে? আমি তো কোনোদিন ওর সঙ্গে একটা কথাও বলিনি? আমাকে কি করেই বা ও চিনলে? আমাকে এ গ্রামে অনেকেই চেনে না, কারণ বহুদিন অনুপস্থিতির পরে আবার দেশে ফিরেচি। ছেলেবেলায় যারা আমায় চিনতো, তাদের মধ্যে অনেকেই এখন বেঁচে নেই। গিরিবালা যদিও সেই সময়ের মানুষ, কিন্তু ও আমাকে জানতো না বা চিনতো না সে সময়।

ওর বসবার জন্যে পিড়ি পেতে দিয়ে আমার স্ত্রী চলে গেলেন।

আমিবললাম—তোমার নাম গিরিবালা না?

—হ্যাঁ বাবা—

—তুমি আমাকে চেনো?

—আপনাকে এ দেশে কে বা না চেনে?

—সেকথা বলচিনে, তুমি আগে আমাকে দেখেছিলে?

—দেখেছিলাম বাবা। তখন তোমার বাবা-মা আছেন। তুমি ইস্কুলে পড়তে যেতে।

—বেশ। বোসো।

কিছুক্ষণ গিরিবালা বসেই রইল চুপ করে। আমি ভাবচি, কেন গিরিবালা এখানে এসেচে? ভেবে কিছুই পাইনে। একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম।

গিরিবালা বেশিক্ষণ কিন্তু আমায় অস্বস্তি ভোগ করতে দিলে না। হঠাৎ সে বেশ গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলে—বাবা, ব্রহ্ম কি?

তার নম্র ভাব ও আগ্রহের সুরে মনে হল জিজ্ঞাসু শিষ্যা যেন পরমজ্ঞানী গুরুর কাছে ব্রহ্মবিদ্যা শুনতে চাইচে।

আমার হাসি পেল। প্রথমটা কিন্তু চমকে উঠেছিলাম।

তা পরিবেশটি মন্দ নয়। আমার সামনে কালকের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'। যুদ্ধের খবর পড়চি। জিনিসপত্রের দাম-দস্তুর ক্রমেই বাড়চে। রাশিয়া হেরে যাচ্চে, হিটলার দুর্মদ বাহিনী লেনিনগ্রাডের উপকণ্ঠে পৌছে গেল। চা খাচ্চি—তামাক ধরাবো একটু পরেই, আর ভাবচি, কাল ডাকঘর থেকে কিছু টাকা না তুললে হাটবাজার হবে না।

এমন সময় সাবেকদিনের কুচরিত্রা স্ত্রীলোক গিরিবালা আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করচে কি, না ব্রহ্মের কথা। তাই না হয় বাপু জিগ্যেস কর দেশের খবর, আজকালকার খবর। যেমন গদাই পাড়ুই আমাকে মাছ দিতে এসে জিজ্ঞেস করে—দাদাঠাকুর, যুদ্ধির খবরটা কি?

মনে মনে চটে যাই। সে খবরে তোর কি দরকার? জার্মানি কোথায়, হিটলার কে, জানিস এসব? ইউরোপের ইতিহাস পড়েচিস? তবে যুদ্ধের খবরের তুই বাপু কি বুঝবি?

গদাই পাড়ুই তবু পদে ছিল। যুদ্ধের খবর জিজ্ঞাসা করা এমন কিছু আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। সে আজকাল সবাই করে থাকে। কিন্তু এ বলে কি? আর ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করবার উপযুক্ত গুরুও কি সে খুঁজে খুঁজে বার করেচে!

প্রশ্নটা চাপা দেবার জন্যে বললাম—তুমি আজকাল থাকো কোথায়?

গিরিবালা বৈষ্ণবোচিত দীনতার সঙ্গে বললে— বাবা, আজকাল আশ্রম করেচি বাজারের পেছনে। গোয়ালপাড়ার মুড়োয় যে বটগাছ, ওরই উত্তর গায়ে।

ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে উঠচে ক্রমশ। গিরিবালা আশ্রম করেচে? এত কথা আমি কি করেই বা জানবো? না জানি ভালো করে ওর পূর্ব ইতিহাস, না জানি ওর বর্তমান জীবনের কোনো খবর।

কথাবার্তা চালু রাখবার জন্যে বললাম—বটে! বেশ, বেশ। একদিন তোমার আশ্রমে যাবো।

গিরিবালা হাতজোড় করে বললে—সে সৌভাগ্যি কি আমার হবে বাবা?

—না, না, সে কি কথা! কতদিন আশ্রম করেচ?

—তা বাবা বৃন্দাবন থেকে যে বছর ফিরলাম, সে বছরই। শ্রাবণ মাসে বৃন্দাবন থেকে ফিরলাম, কার্তিক মাসে আশ্রম পিতিষ্ঠে করলাম।

তাহলে বৃন্দাবনেও গিয়েচে গিরিবালা! না, আগে যা ভেবেছিলাম তা নয়। ব্যাপার জটিল হয়ে উঠেচে। বললাম—বৃন্দাবনেও গিয়েছিলে?

—পাপমুখে আর কি করে বলি?

—আর কোথায় গিয়েচ?

—কোথাও আর যাওয়ার দরকার হয়নি। ওখানেই তিনি আমায় কৃপা করেচেন। আর অনর্থক তীর্থে তীর্থে বেড়িয়ে কি করবো—যা কাজ তা হয়ে গেল। তিনি আমায় দয়া করে সব দিয়েচেন।

তিনি মানে ভগবান! না, এ দেখচি খুবই জটিল ব্যাপার। থৈ পাওয়া যাচ্চে না। গিরিবালা প্রবর্তকের থাকেও নেই, একেবারে কৃপাসিদ্ধ। এর সঙ্গে কথা বলতে সাহস হয় কই।

বললাম— ও।

—আমায় তিনি বললেন, আমাকে তোর পূজা করতে হবে না— তুই যে আমার মা, আমি তোর ছেলে।

—বটে!

আমার চোখ কপালে ওঠবার উপক্রম হয়েছে। আর না, একে এবার তাড়াতে হবে। আর কোনো কথা চলবে না।

বললাম— আচ্ছা গিরিবালা, আর একদিন শুনবো এখন। একটু ব্যস্ত আছি আজ।

কিন্তু গিরিবালাকে অত সহজে ফাঁকি দেওয়া চলে না। সে হাতজোড় করে বললে—আমার কথাটা?

—কি?

—ব্রহ্ম কি?

—ওসব কথার আমি জবাব দিতে পারবো না। তুমি ওপাড়ার গোঁসাই ঠাকুরের কাছে যাও বরং—

—না বাবাঠাকুর, আপনি বলুন।

—তুমি ভুল করেচ গিরিবালা, আমি বইয়ের ব্যবসা করে খাই— ব্রহ্ম-ট্রহ্মের খবর রাখিনে—

—আচ্ছা বাবাঠাকুর, আর একদিন আমি আসবো। আজ ফাঁকি দিলেন, কিন্তু সেদিন ফাঁকি দেবেন না যেন।

আমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে গিরিবালা বিদায় নিল। আমার স্ত্রী জিগ্যেস করলেন— ও কে গো?

—ওর নাম গিরিবালা এইটুকু জানি। আর জানি যে ওকে তিনি নাকি কৃপা করেচেন।

—তিনি কে?

—তিনি আর চিনলে না— তিনি মানে তিনি! ভগবান, গড, শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্ম!

—আহা-হা ঢং!

বলে স্ত্রী বাড়ির মধ্যে চলে গেলেন। আমি সন্ধ্যাবেলায় গ্রামের ফটিক চক্কত্তির কাছে গেলাম। ফটিক চক্কত্তির এখন বয়েস হয়েচে, এক সময় যথেষ্ট আমোদ-প্রমোদ এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদির অনুষ্ঠান করার ফলে এখন ভগ্নস্বাস্থ্য, হাঁপানি-রোগগ্রস্ত।

বললাম—ফটিক কাকা, গিরিবালাকে চেনো?

—এসো বাবা, বসো। কোন্ গিরিবালা? ও নামের অনেক লোক ছিল। কার কথা বলচো?

—এই যে গিরিবালা আশ্রম করেচে গোয়ালপাড়ায়, পথেঘাটে বেড়াতে দেখি।

—ওঃ, বুঝলাম। ওকে আর জানিনে?

—ওকে জানতে?

—জানতে মানে? জানতে মানে? হুঁ, জানতে! বলে—

—যাক যাক, সে সব কথা যাক গে। বলি ও কি রকম লোক ছিল?

—তা ভালো লোক ছিল। অনেক ফুর্তি করিচি ওর সঙ্গে। ওর চেহারা ভারি সুন্দর ছিল। যেমন নাচতে পারতো তেমনি গাইতে পারতো। একবার নন্দ পাল, যতীন দত্ত আর শশী আচায্যি—তিনজনে দোলের দিন ওর ঘরে সে ফুর্তি কি! ও মদ খেয়ে সে ঘুরে ঘুরে নাচ কি! কালাপেড়ে শাড়ি পরে ঘুঙুর পায়ে— তারপরে ইদিকে—

—গিরিবালা মদ খেতো?

ফটিক চক্কত্তি হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গি করে বললে- নাঃ, তোমায় দিয়ে বাবাজি কাজ চললো না! গিরিবালা মদ খেতো মানে? গিরিবালা মদ খেতো মানে কি? গিরিবালা মদের পিপের জন্মো দিয়েচে বলো! তুমি বাবাজি এ সবের কি বোঝো? কেন, গিরিবালার খবর নিচ্চ কেন বলো তো? ব্যাপার কি?

—এই জন্যে নিচ্চি যে সে কাল আমার কাছে এসেছিল—

—তোমার কাছে এসেছিল? কেন তোমার কাছে—তার এখন আর—তোমার কাছে বাবাজি, এখন তার বয়েস কত?

—না কাকা, আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না। সে এখন আর সে গিরিবালা নেই, সে এসেছিল আমার কাছে ব্রহ্মের কথা জানতে।

—কার কথা জানতে?

—ব্রহ্মের কথা।

—সে কে?

—ব্রহ্ম মানে ভগবান, মানে—

—থাক বুঝেছি, থাক বাবাজি। আবার তোমার সামনে যা-তা বেফাঁস বলে ফেলবো বাবাজি—

—আপনি জানেন না, সে আশ্রম করেচে? তিনি তাকে কৃপা করেচেন? তিনি তাকে মা বলে ডেকেছেন—

ফটিক চক্কত্তি বিস্ময়ের সুরে বললে তিনি কে?

—ওই দেখুন আবার আপনাকেও—তিনি মানে, যাকগে—ইয়ে, আমি এখন যাই। আপনার মেজাজ এখন ভালো নেই দেখচি।

—ভালো কি করে হবে বাবাজি? যে কথা তুমি সকালবেলা শোনালে তাতে মেজাজ ভালো রাখবার উপায় কি বলো? গিরিবালা নাকি আশ্রম করেচে। গিরিবালা নাকি—

—আচ্ছা তাহলে এখন আসি ফটিককাকা। আমার একটু কাজ আছে। বসুন।

শশী আচায্যির নাম পেলাম ফটিককাকার মুখে। শশী স্থানীয় কালীমন্দিরের পূজারি, এখন বয়েস হয়েচে। চোখে ভালো দেখতে পান না। তাঁকে গিরিবালার নাম করতে তিনি বললেন— গিরিবালা ডাকসাইটে ইয়ে ছিল। সে সব কথা আর তোমার কাছে বলবো না বাবা। হাঁ জানি, সে আশ্রম করেচে, সন্নিসিনি হয়েচে, ওই যে বলে বৃদ্ধা বেশ্যা তপস্বিনী, তাই—

গিরিবালার পূর্ব ইতিহাস ভালো ভাবেই জানা হয়ে গেল।

সুতরাং সে যখন পুনরায় আমার বাড়ি সেদিন এল, তখন আমি বেশ কৌতূহলের দৃষ্টি নিয়েই ওকে দেখলাম।

বৈকাল বেলা। আমি চা খেয়ে একটু বেড়াতে যাবো ভাবছিলাম। গিরিবালা বললে— বাবা, একটু পড়ে আমায় শোনাবেন? আমি একখানা বই এনেচি—

—কি বই দেখি?

—আপনার বাড়িতেই বইখানা থাক। মাঝে মাঝে এসে শুনে যাবো। বড় ভালো বই বাবা। তা আমি তো লেখাপড়া জানিনে—

বইখানা উলটে-পালটে দেখলাম। বইখানা অত্যন্ত পুরনো, নাম, "সাধনতত্ত্ব ও জীবমুক্তি"।লেখকের নাম শ্রীমৎ ওঙ্কারানন্দ সরস্বতী, প্রাপ্তিস্থান সাধন আশ্রম, গ্রাম সারাড়িতলা, জেলা পুরুলিয়া, মানভূম। এসব ধরনের বইয়ের ওপর আমার কোনো কালে শ্রদ্ধা নেই, তবুও গিরিবালার মনস্তুষ্টির জন্যে পাতার পর পাতা অত্যন্ত কঠিন সেকেলে বাংলায় লেখা সেই তত্ত্ব আমাকে গড়গড় করে পড়ে যেতে হল।

গিরিবালা মাঝে মাঝে হয়তো প্রশ্ন করে— হ্যাঁ বাবা, তাহলে জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সম্পর্কটা কি বলচে?

আমি আবার আগের পাতা থেকে পড়ে যাই। যা বুঝতে পারি ওকে বুঝিয়ে বলি। প্রত্যেক পাতা শেষ হওয়ার পর ভাবি এইবার কি একটা ছুতো করে উঠে পড়া যায়।

ঘণ্টাখানেক এভাবেই কেটে যাওয়ার পরে গ্রামের দু'জন লোক হঠাৎ এসে পড়াতে ধর্মালোচনার আসর ভেঙে গেল। গিরিবালা যাবার সময় বইখানা আমার কাছে রেখে গেল, আবার একদিন যত শিগগির হয় ও আসবে 'সাধন তত্ত্ব' শুনতে। আমার স্ত্রী বললেন— ও তোমার কাছে রোজ রোজ আসে কেন? ও আপদকে রোজ রোজ আসতে দিয়ো না।

—তুমি জানো না, গিরিবালা আগে যেমনই থাক, এখন এর পরিবর্তন এসেচে বলেই মনে হয়।

—তা হোক গে। ও সব লোক কখনো ভালো হয় না। দরকার কি ওর এখানে আসবার?

এবার কিন্তু গিরিবালা যখন এল, তখন সকলের আগে আমার স্ত্রীকে গিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলে। অনেকক্ষণ ধরে কি সব গল্পগুজব করলে। তারপর বাইরে এসে আমার সামনে বসলো। তাকে 'সাধন তত্ত্ব পড়ে শোনাতে হল ঝাড়া দু'ঘণ্টা। ইতিমধ্যে বাড়ির মধ্যে চা খেতে গেলে গৃহিণী বললেন- গিরিবালা কি চলে গেল?

—না বাইরে বসে আছে, সাধন তত্ত্ব শুনবে।

—যাবার সময় যেন এবেলা এখানে খেয়ে যায়।

—কেন, হঠাৎ তার ওপরে এত প্রসন্ন?

—জানো না, সে একগাদা ফুলবড়ি নিয়ে এসেচে! তিনখানা আমসত্ত্ব আর অনেকখানি আমের আচার! আমি বললাম আমি নেবো না। এ তুমি নিয়ে যাও। সে আমারহাতে ধরে জোর করে দিয়ে বললে— এ নিতেই হবে। ব্রাহ্মণের সেবার জন্য এনিচি, ফিরিয়ে নিয়ে যাবো কি বলে? -ওকে এ বেলা খাইয়ে দিতে হবে।

—বেশ, বলচি আমি।

গিরিবালাকে গিয়ে বলতে সে ভারি খুশি হল। এক গাল হেসে বললে– মায়ের হাতে রান্না পেসাদ পাবো— এ কি আমার কম ভাগ্যি? বৃন্দাবনে একবার—

ভালো কথা, বৃন্দাবনে তোমার কি হয়েছিল সেদিন বলছিলে?

গিরিবালার মুখে হঠাৎ যেন ভক্তি ও দীনতার ভাব ফুটে উঠলো। হাতজোড় করে বললে- ঠাকুর যদি কৃপা করেন, তবে মরুভূমিতে ফুল ফোটাতে পারেন—

—নিশ্চয়ই।

—আমি তবে বলি শুনুন, আমি কত সামান্য মানুষ আপনি তা জানেন। বৃন্দাবনে গিয়ে গুপীনাথের ঘেরা বলে জায়গায় আমাদের গাঁয়ের রসিক পরামাণিকের বাসায় উঠলাম। গঞ্জের রসিক পরামাণিক সেখানে অনেকদিন থেকে কাপড়ের ব্যবসা করচে, জানেন তো? রসিকের দিদি বড় ভালো লোক। আমার তো বৃন্দাবনে গিয়ে কি রকম হল, দু'চারদিন মন্দির আর ঠাকুর দেখে দেখে বেড়াই—একদিন একেবারে অজ্ঞান।

—অজ্ঞান ?

—বাবাঠাকুর, একেবারে ভাবের ঘোরে অজ্ঞান।

—বল কি? ভাব-সমাধি?

—যাই বলেন বাবাঠাকুর। দশ-বারো দিন একেবারে দিনরাত জ্ঞান ছিল না আমার। নাওয়া-খাওয়া করতে পারতাম না। না খেয়ে মরতে হোত যদি রসিকের দিদি না থাকতো। কি সেবাটাই করেছিল পনেরো-কুড়ি দিন।

—এই যে বললে দশ-বারো দিন?

—দশ বারো দিন তো একেবারে অজ্ঞান। তারপর জ্ঞান হল বটে, কিন্তু ঘোর কাটে না। উঠতে পারিনে, হাঁটতে পারিনে।

—ফিটের ব্যামো ছিল না তো আগে?

—না বাবাঠাকুর, শুনুন বলি আশ্চর্যি কাণ্ড। সেই অবস্থায় একদিন রসিকের দিদি সন্দেবেলা আমাকে সঙ্গে করে কাছে এক ঠাকুরবাড়িতে নিয়ে গিয়েচে। ফিরে আসচি, পায়ে কিসের একটা ঠোক্কর লেগে হোঁচট্ খেলাম। একখানা ছোট্ট পাথর, মাটিতে অদ্ধেক পোঁতা। মাটি একটুখানি খুঁড়ে হাতে তুলে দেখি বাবা, পাথরের গোপাল মূর্তি। বাবা বলবো কি – আমার সারা গা যেন শিউরে উঠলো। মনে মনে ভাবলাম আমি তো মহাপাপী, আমার ওপর তাঁর এ অহৈতুক কির্‌পা কেন? আমি তো কিছু করিনি তার জন্যি?

গিরিবালার চোখ ছলছল করে এল। নাঃ, ফটিক কাকা যা-ই বলুন, এর সত্যই অনেক পরিবর্তন হয়েচে। ‘পরম মোহান্তী’ হওয়ার পথে উঠেচে দেখচি গিরিবালা। হরিদাস ঠাকুর আর লক্ষহীরার উপাখ্যান চোখের সামনে পুনরায় অভিনীত হতে চলেচে নাকি?

ফটিক কাকার কথা আর শুনচিনে।

বললাম— তারপর?

—তারপর বাবা সেই পাথরের বিগ্রহ আমার কাছে তো এসে ঠেলে উঠল। আঁকড়ে আমায় রইল কি বাবা, কোথাও যেতে চায় না! আমারও বাবা সেই যে বলেচে চৈতন্যচরিতামৃতে—নিজেরে পালক ভাবে, কৃষ্ণে পালা জ্ঞান—আমারও হল তাই। খাওয়া-নাওয়া চুলোয় গেল। গোপাল আমার কি খাবে, গোপাল আমার কি নেবে—এখনো তাই। সেই গোপাল ঘাড়ে চেপে আছে, আর নামতে চায় না। এখানে আমার আশ্রমে তাকেই তো পিরতিষ্ঠে করে তাকে নিয়েই আছি।

—বল কি?

—কি বলবো বাবা, পুজো করতে দেয় না। বলে, তুমি যে আমার মা। মা হয়ে ছেলেকে পুজো করতে আছে? হাত চেপে ধরে। স্বপ্ন দিইছিল রাত্তিরি। ওর জন্যি ভাত রাঁধতে হবে। আর কোনো দেবদেবী আমি জানিনে বাবাঠাকুর— গোপালই আমার সব। গোপালই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। আর কিছু মানিনে।

গিরিবালা অবাকই করেচে আমাকে। হাসবো না কাঁদবো বুঝতে পারিনে।

ও খেয়ে-দেয়ে সেদিন চলে গেল। আমার স্ত্রী খুব যত্ন করেই খাওয়ালেন ওকে। যাবার সময় ও বার বার বলে গেল— সামনের পূর্ণিমার দিন বাবা আমার আশ্রমে ঠিক যাবেন। দেবেন পায়ের ধুলো। বিকেলের দিকি যাবেন।

গেলাম ওর আশ্রমে পূর্ণিমার দিন বিকেলে। ওদের গ্রামের গোয়ালপাড়ার পেছনে খামারকালনা বলে সেকালের গ্রাম। সে গ্রাম এখন জনশূন্য। বড় বড় ভিটে জঙ্গল হয়ে পড়ে আছে। দিনমানে বাঘ বেরোয় খামারকালনায়, বরাবর শুনে এসেছি। সেই খামারকালনায় নির্জন বনের প্রান্তে এক প্রাচীন বটতলায় চারখানা খড়ের ঘর। বটের মোটা সরু ঝুরি নেমে এসেচে চালাঘরের মটকায়। সন্ধ্যামালতী ফুল ফুটেচে আশ্রমের আঙিনায়। বনেজঙ্গলে পাখির দল কিচিরমিচির করচে। ঘন বিকেলের ছায়া দেখে মনে হয় রোদ বুঝি এদিকের ত্রিসীমানায় কোনোদিন ছিল না।

অনেক মেয়ে-পুরুষ দেখলাম ওর আশ্রমে। উঠোনের মাটিতে বটগাছের ছায়ায় বসে তামাক খাচ্ছে পুরুষেরা, মেয়েরা পটল আর লাল ডাঁটা কুটচে রাশীকৃত। আধমণটাক লাল মোটা আউশ চাল ধুচ্চে দুজন

মেয়েতে। আজ নাকি ওরা সবাই এখানে যাবে। প্রতি পূর্ণিমাতেই নাকি এমন হয়। গিরিবালা আমায় পূর্ণিমার দিন আসতে বলেছিল কেন, এখন বুঝলাম।

সন্ধ্যার আগে খোল বাজিয়ে কীর্তন শুরু করলে পুরুষেরা। আরো রবাহূত অনেক পথচলতি লোক এসে জুটলো। জঙ্গলের দূর প্রান্তে গাছের ওপরকার আকাশ জ্যোৎস্নায় সাদা দেখাচ্ছিল। এরা সবাই আশপাশের গ্রামের চাষি, গোপ, কাপালী প্রভৃতি শ্রেণীর নরনারী। সবাই মিলে বেশ আমোদ করচে দেখে আমার খুব ভালো লাগলো। রাত্রে ওরাই রাঁধলে, বড় বড় আঙট কলার পাতা পেতে আউশ চালের ভাত আর লাল ডাঁটার চচ্চড়ি সোনাহেন মুখ করে খেল। যে যখন আসে, আগে দেখি গিরিবালাকে সাষ্টাঙ্গে পরম ভক্তিভরে প্রণাম করে দু-হাতে পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় মুখে দেয়।

আমি অবিশ্যি ওর ওখানে মচ্ছবের প্রসাদ পাইনি। গিরিবালা আমায় খুব যত্ন করে বসালো দাওয়ায়। আমি বললাম—না, আমি গাছতলায় বসি, বেশ লাগছে তোমার এই জায়গাটা, এত বন আছে খামারকালনায় আমার জানা ছিল না।

আমায় বললে—একটু কিছু সেবা না করে যেতে পারবেন না বাবা।

—ভাত আমি খাবো না।

—না বাবা, আউশ চালের মোটা ভাত আপনাদের খেতে দেব কি বলে। ও ওরা খাবে গিয়ে।

—এত চালডাল পেলে কোথায়? খুব খরচ হয় তোমার দেখচি!

—কিছু না বাবা। ওরাই সব আনে। নিজেরাই রাঁধে, আমোদ করে খেয়ে যায়। ওরা বড্ড ভালোবাসে আমাকে। সবই গোপালের ইচ্ছা।

ওর সে বিগ্রহ আমি দেখলাম। খুব ফুল দিয়ে সাজিয়েছে। ছোট একটি পাথরের পুতুলের মতো। সে ঘরে সবারই অবারিত দ্বার। চাষিরা পাকা কলা, বাতাবি লেবু, শশা প্রভৃতি ফল নিয়ে এসেচে, গোপালের বেদির আশেপাশে সেগুলো জমা আছে। সন্ধ্যার সময় ধূপধুনো দেওয়া হয়েচে। ছোট একটা মাটির প্রদীপ মিটমিট করে জ্বলচে ঘরে।

গিরিবালা আমায় বাতাবি লেবুর কোয়া ছাড়িয়ে, শশা কেটে কলার পাতায় সাজিয়ে নিয়ে এসে দিলে। মিষ্টির মধ্যে আখের গুড়। গোটাকতক ছোলা-ভিজে ওই সঙ্গে। ওর আশ্রমের আবেষ্টনীতে বসে সেই পূর্ণিমার প্রথম প্রহর রাত্রে বেশ লাগল খেতে।

গিরিবালার মুখে কিছু ভালো কথা শুনবার জন্যে ওরা এসেচে। গিরিবালা বোধ হয় প্রতি পূর্ণিমাতেই ওদের কিছু কিছু ভালো কথা শোনায়। যারা এসেচে, তারা দেখি কেবলই বলতে লাগলো, মা, আজ দু'কথা বলবেন না? সন্দে উতরে গিয়েচে, এবার বলুন মা—

গিরিবালা সঙ্কুচিত হতে লাগলো আমার সামনে।।

—বাবাঠাকুর বরং কিছু বলুন ওদের। আপনি থাকতি আমি আবার কি শোনাব?

—সে কি কথা! আমি তো ধর্মকথার আচায্যি নিজেকে বলিনি কোনোদিন। রাজনীতির কথা শুনতে চাও শোনাতে পারি। উড়োজাহাজ কি করে হল তার কথা বলতে পারি। কিন্তু তত্ত্বকথা? বাপরে!

গিরিবালা সলজ্জ মুখে বলে—বাবার যেমন কথা! আমিই বা কি কথা বলি? আমি বলি, তাঁর ওপর ভক্তি রাখো, সব হবে। লোকে এসে বিরক্ত করে—আমার গরুর বাছুর হচ্চে না, আমার স্ত্রীর সন্তান হচ্চে না, বেগুনের ক্ষেত থেকে বেগুন চুরি যাচ্চে, গাঁয়ে গরুর ধ্বসা, পশ্চিমের মড়ক লেগেচে, অমুকের বৌয়ের সন্তান হয়ে বাঁচে না— এসব আমার কাছে নালিশ, বিহিত করে দ্যাও মা।

—তবে তো খুব দায়িত্ব তোমার—

—বাবা, ওরা কোথায় যাবে বলুন? সংসারে ধরে কাকে? কার ওপর নির্ভর করে? একটা কিছু চাই তো? আমাকেই এসে মা বলে ধরে। আমাকেই সব ধকল সইতে হয়। আমার কি খ্যামতা বলো, গোপাল ভালো করবেন, গোপালের প্রসাদী ফুল নিয়ে যাও— যা হয় গোপাল করবেন, তাঁর দয়া। বুঝলে না বাবা?

—কাজ হয়?

—হয় বৈকি বাবা। লাগে তুক না লাগে তাক। ঝাড়ে ঢিল মারলে কোনো বাঁশে লাগবেই। ওরা সংসারী মানুষ, ওদের বুঝুতে হবে সংসারের ভেতর দিয়েই। – আপনাকে আলো ধরে পৌঁছে দিয়ে আসুক বাবা—

—না, না, আমি বেশ যাবো এখন, সবে তো সন্দে—

—না বাবা, সন্দের সময় এখানে বাঘ বেরোয়। আপনি যান, সঙ্গে লোক দিচ্ছি, বড় রাস্তায় তুলে দিয়ে আসুক গিয়ে—

বড় রাস্তায় যে লোকটা আমায় আলো ধরে এগিয়ে দিতে এল, ওর দেখি বড় ভক্তি। আমায় বললে—মা একেবারে সাক্ষাৎ—হেঁ হেঁ—উনিই—সব উনিই—

ভক্তিভরে হাত কপালে ঠেকিয়ে উদ্দেশে প্রণাম করলে।

বললাম—খুব ক্ষমতা নাকি?

—উনিই সাক্ষাৎ—উনিই সব। যা বলবেন তাই হবে। ছেলে হবে বল্লি ছেলে হবে, মেয়ে হবে বল্লি মেয়েই হবে। বিষ্টি হচ্চে না, কলাই মুগ বুনতে পারচিনে, জমি ভাঙতে পারচিনে— মাকে গিয়ে ধরলেই হল—

—বলো কি? বাকসিদ্ধ নাকি?

—কি বললেন বাবু বুঝতে পারলাম না—

—না ঠিক আছে। তারপর?

—তারপর মোদের বিপদে-আপদে সব উনি। ওনারে ছাড়া মোরা জানিনে। ছুটে ছুটে আসচি ওঁর কাছে—মা যা করেন।

লোকটি আমাকে রাস্তায় তুলে দিয়ে চলে গেল। যাবার সময় আমার পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করে বললে— দেন একটু চরণের ধুলো ঠাকুরমশাই। আমরা মুরুক্ষু-সুরুক্ষু গরিব মানুষ, কি বুঝি বলুন। অনেক কিছু বলে ফেললাম, অপরাধ নেবেন না। যাই, মা এইসময় দু'একটা ভালো কথা আমাদের শোনান—

—কি কথা?

ভালো কথা। তেনার ভগবানের কথা। আমাদের ওসব কথা কে বলচে বলুন? চাষা লোক সারাদিন ভুঁই চাষ ক্ষেত-খামার নিয়েই থাকি। মায়ের ছিরিমুখ থেকে ছাড়া আর পাচ্চি কোথায় বলুন— কে মোদের শোনাচ্চে?

ও চলে গেল।

এতক্ষণে বেশ চাঁদ দেখা যাচ্ছে ফাঁকে। খামারকালনায় বড্ড জঙ্গল। ঝিঁঝিপোকা আর মুগরো পোকা ডাকচে বনে-ঝোপে।

গিরিবালাকে অন্য চোখে দেখলাম এতক্ষণ পরে। ওর ঠিক স্থানটি কোথায় বুঝতে পেরেচি। ওর সম্বন্ধে আমার যে বিদ্রুপভরা মনোভাব ছিল তা এখন নেই।

গঙ্গা নদী সব জায়গায় নেই, কিন্তু তা থেকে বেরিয়ে শাখা নদী, খাল, সোঁতা সমস্ত দেশের সব লোকের কাছে পৌঁছে দেয় জীবনদায়িনী বারিধারা। গিরিবালা বড় নদীর একটি ক্ষুদ্র সোঁতা, ছোট্ট অজ চাষিদের গ্রামে জল বিতরণ করে বেড়াচ্চে, তা যতই হোক, তবু সেটা জলই, তাতে স্নান করে, জল পান করে লোক তৃপ্ত হয়। নইলে এই সব গরিব লোক বাঁচে কিসে?

ফটিক চক্কত্তির কথা আর শুনচিনে।

এর পরে আমি গিরিবালাকে অনেকবার দেখেচি। একটা জিনিস লক্ষ্য করেচি, যেখানে সংকীর্তন হচ্চে কিংবা ভাগবত পাঠ হচ্চে কিংবা কথকতা হচ্ছে সেখানেই ও সকলের সামনে সারিতে চুপটি করে বসে আছে এবং হাঁ করে শুনচে। খালের জল আগে হয়তো ঘোলা ছিল, এখন ক্রমে ফর্সা হয়ে আসচে।